মজলুম সাহাবি

সাহাবায়ে কেরামের দুঃখ-যাতনার ইতিকথা

রচনা
মাওলানা নুরুল হাসান বুখারি

অনুবাদ
সদরুল আমীন সাকিব

ইহদা
পাবলিকেশন

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আমাদের সুপথের জন্য সাহাবায়ে কেরামের ন্যায় বিশাল নেয়ামত দান করেছেন। তার অজস্র রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মাদের প্রতি এবং তার পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠ মানবদলের প্রতি।

প্রিয় পাঠক, মুসলিম উম্মতের সর্বোত্তম আদর্শ সাহাবায়ে কেরামের জামাত। এই পুণ্যাত্মাগণ কেয়ামত অবধি হেদায়েতের পথে এক মহা নেয়ামত। তাদের মাধ্যমেই আমরা দ্বীনের সঠিক বর্ণনা পেয়েছি, তারাই আমাদের দ্বীনের সঠিক ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন, তারাই আমাদের আল্লাহর জন্য উৎসর্গ হওয়ার পথ দেখিয়েছেন।

কিন্তু আমাদের সাথে তাদের সেতুবন্ধন গড়ার পথটি কি এতটা সহজ ছিল? পিচঢালা পৃথিবীর ন্যায় সে পথ কি এতটা মসৃণ ছিল? মোটেই না! যখনই তারা কবুল করলেন খোদার দ্বীন, উঠে এলেন নবির পথে, তখনই দুনিয়ার সকল এবড়োখেবড়ো পথ এসে জড়ো হলো তাদের সামনে, বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়াল জিন-ইনসানের শয়তানি বাহিনী। তবে খোদার বিশেষ নির্বাচনে উত্তীর্ণ হওয়া এই শ্রেষ্ঠ মানবদল কোনো কণ্টকাকীর্ণতার বাধা মানলেন না, কোনো অপশক্তির পরোয়া করলেন না। খোদার রাহে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন নিজের প্রিয় জীবন, শখের সময় ও সম্পদ।

ইসলাম যখন নবজাতকের নির্মল হাসি নিয়ে দুনিয়ার বুকে নেমে আসে, তখন মক্কার মুশরিকদের বিষাক্ত নিঃশ্বাস তার বিশুদ্ধ অক্সিজেন কেড়ে নিতে কোমর

বেঁধে নামে। তারা ইসলাম কবুলকারী সমাজের দুর্বল সাহাবায়ে কেরামের প্রতি নিজেদের প্রাণপণ বিদ্বেষ উগড়ে দিতে শুরু করে। সম্ভাব্য সকল উপায়ে তাদের কষ্ট-নির্যাতনের চূড়ান্তে পৌঁছে যায়। তবে শুধু দুর্বলদেরই নয়, বরং সমাজের গণ্যমান্য অনেক সাহাবি, এমনকি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায় সম্ভ্রান্ত মানুষকেও তারা নিপীড়নের মাধ্যমে নিচুতার সর্বোচ্চটা দেখিয়ে ছাড়ে!

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে মূল শিরোনাম শুধু সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে হলেও তার সাথে আল্লাহর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলুমিয়তের বিবরণও কিছুটা বিস্তর আকারে তুলে ধরা হয়েছে; এতে একইসাথে পাঠকের নিকট জুলুমের ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ বৃত্তান্ত উপস্থিত থাকবে। অবশ্য এখানে সকল মজলুম সাহাবির বিবরণ চলে আসার দাবি করা যায় না, বরং তার আংশিক বৃত্তান্ত এসেছেই বলা যায়। তবে এখানে নারী সাহাবিদের জুলুমের বিবরণ সচেতনভাবেই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কারণ, তার জন্য ইহদা পাবলিকেশন থেকে 'মজলুম নারী সাহাবি' নামে আমাদের স্বতন্ত্র একটি বই রয়েছে। তাই এখানে তথ্যের দ্বিরুক্তি করে কলেবর বৃদ্ধি করতে চাইনি। নারী সাহাবিদের প্রতি হওয়া জুলুম-অত্যাচার ও তাদের দুঃখ-কষ্ট জানতে 'মজলুম নারী সাহাবি' বইটি অবশ্যপাঠ্য।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে মুহতারাম লেখকের পাশাপাশি অনুবাদকের পক্ষ থেকেও বিভিন্ন তথ্য সংকলন করা হয়েছে; কিছু স্থানে সংযোজন, বিয়োজন, সম্পাদনা ও আলোচনার স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে। টীকায় গ্রন্থসূত্র উল্লেখের ক্ষেত্রে অনুবাদকের সংযোজিত তথ্য এবং কিছু স্থানে লেখকের গ্রন্থসূত্রের ক্ষেত্রে আমার সামনে থাকা পাণ্ডুলিপির খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে শেষে (*) স্টার চিহ্ন উলেখের মাধ্যমে পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে। সর্বোপরি বইটি পাঠকদের জন্য আরও বেশি তথ্যবহুল, উপকারী ও সাবলীল করার চেষ্টা করা হয়েছে।

তবে মানুষ ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়, তাই আমাদের কাজেও যেকোনো ধরনের অসঙ্গতি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক; আর আমরা তা সংশোধন করে নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রিয় পাঠক-পাঠিকার নিকট অনুরোধ থাকবে, যেকোনো ধরনের সংশোধনী বা পরামর্শ জানিয়ে আমাদের বাঁধিত করবেন।

পরিশেষে, মহান আল্লাহ বইটি কবুল করুন, উম্মতের জন্য উপকারী করুন, লেখক-প্রকাশকসহ এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি মানুষকে এর জন্য আখেরাতে পুরস্কৃত করুন। আমিন।

সদরুল আমীন সাকিব
০৭ এপ্রিল ২০২৫
sadrolaminsakib@gmail.com

সূচিপত্র

লেখকের ভূমিকা ১১

প্রথম অধ্যায়

সাহাবায়ে কেরামের মজলুমিয়ত ১৩
জুলুম-নির্যাতনই ছিল হিজরত ও জিহাদ বিধিত হওয়ার কারণ ১৫
একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ ১৬
হিজরতের পথে মজলুম সাহাবিগণ ১৮
হাবশার দ্বিতীয় হিজরত ২১
মদিনার পথে হিজরত ২২
কুরআনে কারিমে হিজরতের আলোচনা ২৩
মুহাজির সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা ২৬
গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ২৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল্লাহর রাসুল ও সাহাবায়ে কেরামের ওপর জুলুম-নির্যাতন ৩০
নির্যাতনের ধরন ৩১

প্রথম পরিচ্ছেদ

রহমতে আলমের মজলুমিয়ত ৩২
৬. চাচা আবু লাহাব ও চাচি উম্মে জামিলের চরম দুশমনি ৩৬
১২. আবু জাহেলের কটূকথা ও হজরত হামজা রা.-এর ইসলাম গ্রহণ ৪১
১৩. আল্লাহর রাসুলকে আবু জাহেলের অপদস্থ করার পরিকল্পনা ৪৪

১৫. তায়েফে রহমতে আলমের ওপর পাথর নিক্ষেপ ৪৬
১৬. হত্যা পরিকল্পনা ও শিয়াবে আবু তালেব গিরিপথে অবরুদ্ধ জীবন ৪৭
১৭. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলিজার টুকরাকে কষ্ট দেওয়া ৫০
১৮. মৌখিক নির্যাতন ৫১
২১. গালিগালাজ ৫৪
২২. বিদ্রুপ ও তিরস্কার ৫৪
২৩. কটাক্ষ করে নাম দেওয়া ৫৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাহাবায়ে কেরামের মজলুমিয়ত ৫৬

প্রথম অনুচ্ছেদ

সমাজের দুর্বল শ্রেণির মজলুম সাহাবি ৬১
১. হজরত বেলাল ইবনে রাবাহ রা. ৬১
২. হজরত খাব্বাব ইবনে আরাত রা. ৬৪
৩. হজরত ইয়াসির ইবনে আমের রা. ৬৬
৪. হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. ৬৮
৫. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসির রা. ৭১
৬. হজরত সুহাইব ইবনে সিনান রুমি রা. ৭১
৭. হজরত আবু ফুকাইহা রা. ৭৪
৮. হজরত আমের ইবনে ফুহাইরা রা. ৭৫

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

সমাজের প্রভাবশালী শ্রেণির মজলুম সাহাবি ৭৭
৯. হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. ৭৮
১০. হজরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. ৮৪
১১. হজরত উসমান ইবনে আফফান জুন্নুরাইন রা. ৯০
১২. হজরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা. ৯২
১৩. হজরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা. ৯৩
১৪. হজরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. ৯৪

১৫. হজরত আমের ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. ৯৬
১৬. হজরত আবু জর গিফারি রা. ৯৭
১৭. হজরত খালেদ ইবনে সাইদ রা. ৯৮
১৮. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ১০১
১৯. হজরত সাইদ ইবনে যায়েদ রা. ১০৩
২০. হজরত উসমান ইবনে মাজউন রা. ১০৪
সাহাবায়ে কেরামের ইমান জাগানিয়া জীবন ১০৬

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

মক্কায় বন্দিত্বের শিকার মজলুম সাহাবি ১০৮
২১. হজরত আইয়াশ ইবনে আবু রবিয়া রা. ১০৮
২২. হজরত সালামা ইবনে হিশাম রা. ১০৯
২৩. হজরত ওয়ালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা. ১১০
তিন সাহাবি হত্যার পাঁয়তারা ১১২
২৪. হজরত মুসআব ইবনে উমাইর রা. ১১৩
২৫. হজরত হিশাম ইবনে আস রা. ১১৪
এক ইমান জাগানিয়া শিক্ষণীয় ঘটনা ১১৫
২৬-২৭. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সুহাইল রা. ও হজরত আবু জানদাল ইবনে সুহাইল রা. ১১৮
২৮. হজরত আবু বাসির রা. ১২১
২৯. হজরত তুলাইব ইবনে উমাইর রা. ১২৩

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

বস্ত্রহীনতা, পানি বঞ্চনা ও অন্যান্য জুলুমের শিকার মজলুম সাহাবি ১২৫
৩০. হজরত আবদুল্লাহ মুযানি (জুল বিজাদাইন) রা. ১২৫
৩১. হজরত আবু উমামা বাহেলি রা. ১২৬
৩২. হজরত আবু রাফে রা. ১২৮
৩৩. হজরত উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফি রা. ১৩০
৩৪. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে হুজাফা সাহমি রা. ১৩২
অসমাপ্ত কাহিনি ১৩৪
খোদার নিকট মুনাজাত ১৩৪

লেখকের ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তায়ালার নির্বাচিত বান্দা মহান নবি-রাসুলগণের প্রতি বর্ষিত হোক অগণিত রহমত ও সালাম।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, হজরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম ইসলামের দাওয়াত ও তাবলিগ, হিজরত ও জিহাদের মতো আমলে যেভাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শরিক ছিলেন, তদ্রূপ আল্লাহর পথে অবস্থান করতে গিয়ে কাফেরদের পক্ষ থেকে কষ্ট-নির্যাতন ভোগ করার ক্ষেত্রেও তার সহযাত্রী ছিলেন।

বস্তুত মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রিসালাতের এই সূর্যসন্তানরাও যে অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, মক্কার কাফের-মুশরিকদের হাতে অগ্নিপরীক্ষায় যেভাবে বেদনায় ছটফট করেছেন, যেভাবে একই সাথে ধূলিবালি ও রক্তে রঞ্জিত হয়েছেন, যেভাবে বর্শায় বিদ্ধ হয়েছেন এবং তিরের আঘাতে দেহে চালনির মতো অগণিত ক্ষত বয়ে বেড়িয়েছেন, সে কথা কল্পনা করতে গেলেও মানুষের গায়ে কাটা দিয়ে ওঠে! এমনকি কিছু অসহায় সাহাবি তো জুলুম-নিপীড়নের জাঁতাকলে এতটাই পিষ্ট হয়েছিলেন যে, তা বরদাশত করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত শাহাদাতের কোলে ঢলে পড়েন!

এবার জানতে চাচ্ছেন বুঝি কাফেরদের হাতে সেই অসহায়দের বন্দিত্বের যাতনা, পায়ে শিকল ও বেড়ির দাগ, ক্ষুৎপিপাসার কষ্ট, গায়ের পোশাক খুলে নেওয়ার লজ্জা, মৌখিক কষ্ট ও গালমন্দের ন্যায় হাজার রকম নিপীড়নের কথা? সে কথা

আর কী বলার আছে বলুন! এসব তো ছিল কাফেরদের জন্য নস্যি। ইচ্ছে হলেই অবাধে ঝাঁপিয়ে পড়ত তীব্র আক্রোশে।

সারকথা, শুধু ইসলাম গ্রহণের অপরাধে(!) এবং আল্লাহকে একক প্রভু বলার দায়ে সাহাবায়ে কেরামকে যে নির্মম নিপীড়ন ও কঠোরতা সইতে হয়েছে, মানবেতিহাসে তার উপমা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু এত সবের পরেও তাদের ইমান কতটা মজবুত ও আমাদের জন্য ইমান জাগানিয়া ছিল। একবার চিন্তা করুন, এত অগ্নিপরীক্ষা ও রক্তনদী পাড়ি দিয়েও তাদের মাঝে একজন মজলুমও নিজের ইমান থেকে সরে আসেননি, এবং রক্তপিপাসু নিষ্ঠুর কুরাইশ কাফেরদের জল্লাদি ও নির্মমতা এই খোদাপ্রেমিক ও ইশকে নবির জামাত থেকে একজন সদস্যকেও আপন অবস্থান থেকে টলাতে পারেনি। বরং এসব মহাকাব্যের মহাপ্রেমিকদের কাছে এ সকল বিপদাপদ ও দুঃখ-মুসিবত যেন ঐশ্বরিক স্বাদ ও আনন্দেরই মনে হতো!

এ দুনিয়ার বুকে মজলুমের সংখ্যা কম নয়। মানুষের হাজার রকম জুলুম-অত্যাচার সহ্য করতে হয়। তবে এই নির্যাতন-নিপীড়ন ও কঠোরতার মাঝেও যদি কেউ স্বাদ খুঁজে পেয়ে থাকে, তাহলে সেটা ওই রাসুলপ্রেমিকদের ভাগ্যেই জুটেছিল।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি ওই শিহরণ জাগানিয়া দুঃখ-কষ্ট ও জুলুম-নির্যাতনের এক রক্তাক্ত আখ্যান, যে স্টিম রোলারে নিষ্পেষিত হয়েছিলেন সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠ মানবদল। কিন্তু ওই পবিত্রাত্মা পাগলপারার দল ইসলামের খাতিরে সকল দুঃখ-যাতনাই হাসিমুখে কবুল করে নিয়েছিলেন।

মূলত আমাদের এই ইসলাম সম্মানিত ওই মানুষদের মজলুমিয়ত ও কষ্ট-সহিষ্ণুতারই সুমিষ্ট ফল। গোটা মুসলিম উম্মতের পক্ষে কেয়ামত অবধি আশেকে রাসুলদের এই মহা অবদানের ঋণের কথা কখনোই ভোলা সম্ভব না। আল্লাহ তায়ালা তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্টির বারি বর্ষণ করুন।

মাওলানা নুরুল হাসান বুখারি

***

প্রথম অধ্যায়

সাহাবায়ে কেরামের মজলুমিয়ত

সিরাত ও ইতিহাস গ্রন্থাবলির বিশাল ভান্ডার সাহাবায়ে কেরামের ওপর পরিচালিত নির্মম নির্যাতনের বিবরণে ভরপুর রয়েছে। এর পাশাপাশি কুরআনে কারিমও এই নিপীড়িত শ্রেণিটির কথা বিশেষ আলোচনায় রেখেছে। বস্তুত সিরাতবিদ ও মুসলিম ঐতিহাসিকদের পূর্বে স্বয়ং মহাপ্রতিপালক আল্লাহ তায়ালাই তাদের নিপীড়িত হওয়ার বিবরণ ও রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন, নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ, রাসুল ও দ্বীনের প্রতি জান উৎসর্গকারী মহান সাহাবায়ে কেরামের ওপর পরিচালিত নির্যাতনের কথা কুরআনের বর্ণনায় লক্ষ করুন,

وَ اذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ

‘আর স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন তোমরা সংখ্যায় ছিলে অল্প (এবং নিজেদের) দেশে দুর্বল। তোমরা তখন ভয় করতে যে, পাছে লোকে তোমাদের অকস্মাৎ তুলে নিয়ে যায় নাকি!’[১]

আয়াতের ভাষা লক্ষ করুন—‘পাছে লোকে তোমাদের অকস্মাৎ তুলে নিয়ে যায় নাকি!’ প্রকৃতপক্ষে এই ভাষার ব্যবহার থেকে প্রাথমিক যুগের সাহাবায়ে কেরামের চূড়ান্ত অসহায়ত্ব ও মজলুমিয়তের চিত্র প্রকাশ পায়। পাশাপাশি এখান থেকে খুব স্পষ্টভাবে এ চিত্রও কল্পনা করা যায় যে, আল্লাহর রাসুলের এই আশেকগণ মক্কার জমিনে কতটা মুসিবতের সাথে নিজেদের দিন পাড় করছিলেন।

وَ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا

১. . সুরা আনফাল, আয়াত ২৬

‘(হে মুসলিম জাতি,) তোমাদের কী হলো যে, তোমরা যুদ্ধ করো না আল্লাহর পথে এবং সেসব অসহায় নরনারী ও শিশুদের জন্য, যারা (আল্লাহকে ডেকে) বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে এই জনপদ থেকে বের করে নিয়ে যান, যার অধিবাসীরা অত্যাচারী।’[২]

একবার চিন্তা করে দেখুন, মক্কার মুশরিকদের জুলুম-অত্যাচার, জল্লাদপনা, রক্তপাত কি কখনো শেষ হতে পারে, যেখানে স্বয়ং কুরআন মাজিদই তাদেরকে জালেম নামে অভিহিত করেছে! ফলে তাদের নির্যাতনে অতিষ্ট হয়ে অবশেষে সাহাবায়ে কেরাম হিজরতের মতো কঠিন পথ বেছে নেন। কিন্তু মক্কাতে এমন অনেক দুর্বল অসহায় নরনারী ও বাচ্চাকাচ্চা রয়ে গিয়েছিল, যারা একেবারেই উপায় না থাকার কারণে মক্কা থেকে মদিনা পর্যন্ত যেতে পারছিল না অথবা কাফেররা তাদেরকে জুলুম থেকে মুক্তির জন্য ছাড়তে রাজি হচ্ছিল না। কাফেররা পৈশাচিক মনের তৃপ্তি মেটাতে তাদের মতো অসহায় দুর্বল মুসলিমদের ওপর জুলুম চালাত। আর এই মজলুম বিপর্যস্ত সাহাবিরা হৃদয় উজাড় করে মহান রবের দরবারে কাকুতি জানাতেন, হে আমাদের প্রতিপালক, এই জালেমদের অত্যাচারের মুষ্টি থেকে আমাদের মুক্তির কোনো উপায় বের করে দিন।

অবশেষে মহান খোদা তাদের আকুল আবেদন কবুল করেন। ইতিমধ্যে যে সকল সাহাবি মদিনা তাইয়িবাতে পৌঁছে গিয়েছিলেন, তাদেরকে মক্কার মজলুম সাহাবিদের মুক্ত করে আনার জন্য জিহাদের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়।

وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ؕ وَ لَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

‘যারা নির্যাতিত হওয়ার পর আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে হিজরত করেছে, নিশ্চয় আমি দুনিয়াতেও তাদের উত্তম নিবাস দান করব। আর আখারাতের প্রতিদান তো নিঃসন্দেহে অনেক বড়। হায় যদি তারা জানত!’[৩]

---

২. সুরা নিসা, আয়াত ৭৫

৩. সুরা নাহল, আয়াত ৪১

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَ صَبَرُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

‘যারা নির্যাতিত হওয়া পর হিজরত করেছে, তারপর জিহাদ করেছে ও অবিচল থেকেছে, নিশ্চয় এসব বিষয়ের পর আপনার প্রতিপালক (তাদের প্রতি) অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’[৪]

জুলুম-নির্যাতনই ছিল হিজরত ও জিহাদ বিধিত হওয়ার কারণ

এ সকল আয়াত থেকে এ তত্ত্বও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সাহাবায়ে কেরামের হিজরতের মূল কারণ ছিল তাদের ওপর চলা নির্মম জুলুম-নির্যাতন। মক্কার মুশরিকদের এই নিপীড়ন, জল্লাদপনা ও রক্তপিপাসার ধারা যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যখন সাহাবিদের ওপর তাদের ক্রোধবিদ্বেষ, কঠোরতা আর কষ্ট ও শাস্তি প্রদানের সিলসিলা সীমা অতিক্রম করে, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে হিজরতের অনুমতি আসে। তাই এ বিষয় একদম স্পষ্ট যে, পবিত্রাত্মা সাহাবায়ে কেরামের হিজরত ছিল নিতান্তই জুলুম-অত্যাচারের প্রতিষেধক হিসেবে।

তদ্রূপ জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার কারণও ছিল তাদের ওপর চলা সেই নির্মম নিপীড়ন। আর এ নিপীড়নের একমাত্র কারণ বলে দেখানো হয়েছে যে, তারা শুধু মহান আল্লাহকেই নিজেদের রব বলে স্বীকার করত, অন্য কোনো উপাস্যকে তার সাথে শরিক করত না। এ ছাড়া তাদের দ্বিতীয় কোনো অপরাধ(!) ছিল না। যেমন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۙ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ

‘যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরকে (যুদ্ধ করার) অনুমতি দেওয়া হলো। কেননা তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে। আর আল্লাহ তাদেরকে বিজয়ী করতে পূর্ণ সক্ষম। তাদেরকে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে কেবল এ কারণে বের করে দেওয়া হয়েছিল যে, তারা বলত, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ...।’[৫]

৪. সুরা নাহল, আয়াত ১১০

৫. সুরা হজ, আয়াত ৩৯-৪০

হ্যাঁ, শুধু আল্লাহর একত্ববাদ ও তাওহিদের কথা উচ্চারণ আর তার প্রতি দাওয়াতের কারণেই মক্কার মুশরিকরা সাহাবায়ে কেরামের ওপর ক্রোধের উদ্গীরণ ঘটায় এবং ইতিহাসের বর্বরতম নিপীড়ন চালায়। এমনকি তার মাত্রা এতটাই সীমা ছাড়ায় যে, অবশেষে এই অসহায় মজলুম মানুষগুলো নিজেদের প্রিয় ঘরবাড়ি ও দেশ ছেড়ে দেশান্তর হতে বাধ্য হন। সে ধারায় মক্কা ছেড়ে তাদের প্রথমে হাবশায়, তারপর মদিনার পথে দেশ ছাড়তে হয়। কিন্তু দেশ থেকে বিতাড়ন করেও যখন মক্কার কাফেরদের মন ভরল না, বরং এখানেও তাদের শান্তির ঘুম হারাম করতে উঠেপড়ে লাগল এবং মদিনার ওপর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হলো যে, ইসলাম ও মুসলিমদের সমূলে ধ্বংস করে দিতে হবে, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে জিহাদ ফরজ করা হয়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ

সাহাবায়ে কেরামের মজলুমিয়তের আলোচনার ভেতর দিয়ে এই বাস্তবতাও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, প্রত্যেকজন মুহাজিরই অন্যায়ের শিকার হয়ে ও নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে দেশান্তর হয়েছিলেন। যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, তাদের কোনো ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ ছিল, তাহলে তা একমাত্র এটাই যে, তারা ইমান ও ইসলামের সামনে আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং শুধু এক আল্লাহর রুবুবিয়ত ও তাওহিদের ঘোষণা ও প্রচার করেছিলেন।

তাহলে সেসব লোক কতটা অপরাধী হতে পারে একবার চিন্তা করুন, যারা হজরত সাহাবায়ে কেরাম, বিশেষত মুহাজির সাহাবিদের পবিত্র ইমান-আমলে কলঙ্ক লেপনের চেষ্টা চালায় এবং তাদের নির্মল চরিত্রকে নিন্দা ও অভিযোগের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে মানুষের মাঝে ঘুরে বেড়ায়। হায় আফসোস! তারা যদি আল্লাহর কিতাবের প্রতি সত্যিই ইমান আনত, যেখানে সকল মুহাজির সাহাবির পবিত্র মনন, নির্মলতা, নির্লোভতা ও নির্দোষিতার সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে!

প্রকৃত বিষয় হচ্ছে, মক্কার মুশরিকদের জুলুম-অত্যাচার ও অন্যায়-অবিচারের ধারা শেষ হয়ে গেছে বটে, কিন্তু সাহাবিদের দুশমনশ্রেণির অবিচারের ধারা এখনো বহাল তবিয়তে আছে। আল্লাহ তায়ালা এই অন্যায়কারীদের হেদায়েত নসিব করুন। সারকথা, সাহাবায়ে কেরামের ওপর পরিচালিত জুলুমের

ধারাবাহিকতা এখনো ধারাবাহিক রয়েছে। এর নিরবচ্ছিন্নতায় কোনো ছেঁদ পড়েনি। মহান আল্লাহ সাহাবায়ে কেরামকে তাদের যাবতীয় মজলুমিয়তের জন্য পরিপূর্ণ প্রতিদানে ভূষিত করুন। আমিন। মহান আল্লাহ মজলুম সাহাবিদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা দিয়ে বলেন,

فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ اُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَ قٰتَلُوْا وَ قُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَ لَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ

‘সুতরাং যারা হিজরত করেছে, যাদেরকে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, যারা আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং (দ্বীনের জন্য) যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে, আমি অবশ্যই তাদের সকলের দোষত্রুটি মিটিয়ে দেব এবং তাদেরকে অবশ্যই এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাব, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত হবে। (তারা এসব লাভ করবে) আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কারস্বরূপ। আর আল্লাহর নিকটই রয়েছে উত্তম প্রতিদান।’[৬]

পবিত্র কুরআনের জীবন্ত সাক্ষ্যের মাধ্যমে অবগত হওয়া যায় যে, মহান মুহাজির সাহাবায়ে কেরাম যত ধরনের দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়েছেন, তা একমাত্র আল্লাহর পথে দাঁড়ানোর জন্যই। আর সে কারণে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বিনিময় ও প্রতিদানস্বরূপ তাদের অর্জিত হয়েছে জান্নাত। আল্লাহর সেই প্রতিদানই সর্বোত্তম ও সর্বোন্নত। অথচ সেসব মানুষের পক্ষ থেকে সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর পথে নিজেদের জুলুম-নির্যাতন ও দুঃখ-কষ্ট এবং ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার বিনিময় হিসেবে কেবল পেয়েছেন নিন্দা-তিরস্কার ও অভিযোগ-অপবাদের মালা। আহ, কত নিকৃষ্ট সেই প্রতিদান। কত নিকৃষ্ট সেসব প্রতিদানদাতা। আল্লাহ তাদের ভাগ্যে হেদায়েত নসিব করুন।

সারকথা, কুরআনের বহুবিধ আয়াতের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামের মজলুমিয়ত ও নিপীড়িত হওয়ার বিষয় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। বিশেষত উপরোল্লেখিত সুরা নাহলের ৪১ ও ১১০ নম্বর আয়াত এবং এ জাতীয় অন্যান্য আয়াত থেকে এ

৬. সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯৫

বিষয়ও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, জুলুম-অত্যাচার ও অন্যায়-অবিচারের পরেই হিজরতের ঘটনা ঘটে। যখন কুরাইশের নির্যাতন, জল্লাদপনা ও রক্তপিপাসা চূড়ান্তে পৌঁছে যায়, ওই সঙ্গিন মুহূর্তেই আল্লাহর পক্ষ থেকে হিজরতের নির্দেশ আসে। নিম্নে হিজরত বিষয়ক কিছু বর্ণনা উল্লেখ করা হলো।

হিজরতের পথে মজলুম সাহাবিগণ

কুরাইশের কাফেররা যখন আল্লাহর প্রতি ইমান আনার কারণে দুর্বল অসহায় সাহাবায়ে কেরামের ওপর চূড়ান্ত নিপীড়ন চালানো শুরু করে এবং সুপ্রশস্ত মক্কাভূমি যখন মুসলিমদের কাছে অত্যন্ত সংকীর্ণ অনুভূত হতে থাকে, তখন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই খোদার প্রেমমগ্ন ও রিসালাতসূর্যের অনুসারীদের হাবশার পথে হিজরতের দিকনির্দেশনা দেন।

মূলত হিজরতের বিষয়ই এই বাস্তবতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট যে, মক্কার রক্তপিপাসুদের পিপাসা ও নির্দয়তা ধৈর্যের বাঁধ ভাঙা পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। আর সে কারণেই ইসলামের প্রতি জান উৎসর্গকারীর একটি দল প্রিয় দেশ ও মাতৃভূমিকে 'ভালো থেকো' বলে বিদায় জানিয়ে ভিনদেশি হওয়ার মর্মযাতনা কবুল করে নিতে বাধ্য হন।

হাফেজুল হাদিস ইবনে আসাকির রহ. হজরত উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণনা করেন, মক্কা যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিদের জন্য সংকুচিত হয়ে আসে, সীমাহীন কষ্ট ও শাস্তির সামনে যখন তাদেরকে দাঁড় করানো হয়, দ্বীনের ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে থাকেন, এদিকে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে তাদের বাঁচানোর সাধ্যও ছিল না, তখন তিনি তাদের হাবশায় হিজরত করার আদেশ দেন।[৭]

ইমাম ইবনে সাদ রহ. ইমাম জুহরি রহ. থেকে বর্ণনা করেন, যখন মুসলিমদের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং তারা ইমানের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে, তখন অনেক মুশরিক নিজ গোত্রের ইমান আনয়নকারীদের ওপর হামলে পড়ে। তারা তাদের ওপর নিষ্ঠুর নির্যাতন চালায়, তাদের বন্দি করে রাখে এবং তাদেরকে দ্বীন থেকে বিচ্যুত করার প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হয়।

---

৭. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩/৭২

এরই প্রেক্ষিতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে হাবশায় হিজরত করার নির্দেশনা দেন। প্রথম হিজরতের সময় ১১জন পুরুষ ও ৪জন নারী অংশ নেন। এটা জানতে পেরে কুরাইশ কাফেররা সমুদ্রের উপকূল পর্যন্ত তাদের পিছু নেয়, কিন্তু সাহাবিরা ততক্ষণে জাহাজে উঠে চলে গিয়েছিলেন।[৮]

ইমাম ইবনে সাদ ও ইমাম ইবনে হিশাম রহ. এই ১৫জন মুহাজির সাহাবির বিস্তারিত তালিকা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে সর্বপ্রথমে রয়েছে হজরত উসমান ইবনে আফফান রা. ও তার স্ত্রী আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা হজরত রুকাইয়া রা.-এর নাম। পাশাপাশি আরও আছে হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ, হজরত উসমান ইবনে মাজউন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হজরত মুসআব ইবনে উমাইর প্রমুখের নাম।[৯] রাদিয়াল্লাহু আনহুম। ইমাম ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, তারপর হজরত জাফর ইবনে আবু তালেব রা. হাবশার পথে হিজরত করেন। তার সাথে অন্য অনেক মুসলিমও হিজরতের পথ ধরেন।[১০]

মাওলানা শিবলি নোমানি রহ. লেখেন, সাধারণত ঐতিহাসিকদের ধারণা যে, হিজরত শুধু সেসব মানুষই করেছিলেন, মক্কায় যাদের কোনো আশ্রয়দাতা ও হেফাজতকারী ছিল না। কিন্তু মুহাজির সাহাবিদের তালিকায় দেখা যায়, প্রত্যেক পর্যায়ের মানুষই সেখানে ছিলেন। মূলত এর ভিত্তিতে এ কথাই অধিক যৌক্তিক মনে হয়, কুরাইশের জুলুম-অবিচার শুধু অসহায় সাহাবিদের ওপর সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং বড় বড় গোত্রের অনেক সাহাবিও এই নিপীড়ন থেকে নিরাপদ ছিলেন না।

একটি আশ্চর্য বিষয় হলো, যেই সাহাবিদের ওপর সবচেয়ে বেশি জুলুম-নির্যাতন চালানো হয়েছিল এবং যাদেরকে বলা যায় আগুনের বিছানায় শুইয়ে ঝলসে দেওয়া হয়েছিল—অর্থাৎ হজরত বেলাল, হজরত আম্মার, হজরত ইয়াসির ও অন্যান্য সাহাবি, সেই তাদের নামই হাবশার হিজরতের তালিকায় দেখা যায় না! এর কারণ হয়তো তারা এতটাই নিঃস্ব ছিলেন যে, এত বেশি নির্যাতন সত্ত্বেও তাদের পক্ষে দেশত্যাগের যাত্রার সামর্থ্য ও উপায় ছিল না। অথবা এটাও হতে

৮. তবাকাতে ইবনে সাদ, ১/২০৩

৯. তবাকাতে ইবনে সাদ, ১/২০৪

১০. সিরাতে ইবনে হিশাম, ১/৩৪৫

পারে, তারা এই নিপীড়নের মধ্যেই খোদার পক্ষ থেকে বিশেষ মিষ্টতার স্বাদ পেয়ে গিয়েছিলেন। ফলে এটা ছেড়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।[১১]

মাওলানা শিবলি নোমানি রহ. আরও লেখেন, বাদশা নাজাশির উদারতার বদৌলতে মুসলমানরা হাবশায় শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করতে থাকে। কুরাইশ কাফেরদের কানে এ সংবাদ পৌঁছলে তারা ক্রোধোন্মত্ত ও অস্থির হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত তাদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, বাদশা নাজাশির কাছে দূত পাঠিয়ে অনুরোধ জানানো হবে, আমাদের দেশের অপরাধীদের আপনার দেশ হতে বহিষ্কার করে দিন। এ কাজের জন্য কাফের থাকাকালীন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু রবিয়া ও হজরত আমর ইবনে আছের ওপর দায়িত্ব অর্পন করা হয়। তারপর বাদশা নাজাশি ও তার দরবারের প্রতিজন উপদেষ্টার জন্য মূল্যবান ও দামি দামি উপহার প্রস্তুত করে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে এই রাষ্ট্রীয় মিশন হাবশার পথে রওনা হয়।

মক্কার দূতরা হাবশা পৌঁছে বাদশার কাছে অনুরোধ জানায়, আপনি আমাদের দেশের অপরাধীদের আমাদের হাতে তুলে দিন। ওদিকে উপহার পেয়ে বাদশার উপদেষ্টারাও এ প্রস্তাবের পক্ষে সায় দেয়। কিন্তু বাদশা ব্যাপারটি যাচাই করার তাড়না অনুভব করেন। তাই তাৎক্ষণিক প্রস্তাব গ্রহণ না করে প্রথমে মুসলমান মুহাজিরদের রাজদরবারে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেন। তারপর তাদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে জানতে চান।

বাদশার নির্দেশ পালনে হজরত জাফর রা. কথা বলেন এবং ইসলামি ইতিহাসের তাওহিদবাদী বিখ্যাত সেই ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন, মহান রাজা, আমরা ছিলাম একটি মূর্খ জাতি। মূর্তিপূজা করতাম, মৃত জন্তু খেতাম, ব্যভিচারে লিপ্ত হতাম, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, প্রতিবেশীর সাথে মন্দ ব্যবহার করতাম, শক্তিশালীরা দুর্বলদের শোষণ করতাম। তারপর আমাদের মাঝে এমন একজনের আবির্ভাব ঘটে, যিনি আমাদেরকে ইসলামধর্মের প্রতি দাওয়াত প্রদান করেন। তখন আমরা তার ডাকে ইমান আনি, শিরিক ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করি এবং সকল প্রকার মন্দ কাজ থেকে ফিরে আসি। মূলত এই অপরাধেই(!) আমাদের জাতি আমাদের জানের দুশমনে পরিণত হয় এবং আমাদের বাধ্য করতে চায়, আমরা

---

১১. সিরাতুন নবি, ১/২১৯-২২০

যেন আবারও পূর্বের ভ্রষ্টপথে প্রত্যাবর্তন করি। এভাবে হজরত জাফর রা. আরও বিস্তারিতভাবে ইসলামের শিক্ষা-চরিত্রের কথা বাদশার কাছে খুলে বলেন।

এদিকে হজরত জাফরের ভাষণে বাদশা প্রভাবিত হন এবং বাস্তবতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। তাই তিনি কুরাইশ দূতদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলেন, তোমরা ফিরে যাও, আমি কখনোই এই নির্যাতিতদের তোমাদের হাতে সোপর্দ করব না।

ঘটনাটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। পাশাপাশি সিরাতে ইবনে হিশামেও এর বিস্তারিত বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে।[১২]

সিরাতে ইবনে হিশাম গ্রন্থের বর্ণনায় হজরত জাফর রা. নিম্নোক্ত ভাষায় কুরাইশের জুলুমের বিবরণ দিয়েছিলেন যে, তারা যখন আমাদের ওপর কঠোর আচরণ, জুলুম ও আমাদেরকে কোণঠাসা করতে শুরু করল এবং আমাদের দ্বীন পালনের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল, তখন আমরা আপনার দেশে (আশ্রয়ের জন্য চলে) এলাম।[১৩]

সিরাতুন নবি গ্রন্থে লেখা হয়েছে, প্রায় ৮৩জন মুসলমান হাবশায় হিজরত করেন। সেখানে কিছু দিন শান্তিতে অবস্থানের পর হঠাৎ তাদের কাছে (গুজবভিত্তিক) এক সংবাদ আসে, মক্কার মুশরিকরা ইসলাম কবুল করে নিয়েছে। এ খবর শুনে অধিকাংশ মুহাজির মক্কার পথ ধরেন। কিন্তু মক্কার কাছাকাছি পৌঁছে বুঝতে পারেন, সংবাদটি ভিত্তিহীন ছিল। ফলে কিছু মুসলমান আবারও ফিরে চলে যান, আর অধিকাংশ মানুষ গোপনে মক্কায় প্রবেশ করেন।[১৪]

হাবশার দ্বিতীয় হিজরত

যে সকল মুসলিম হাবশা থেকে ফিরে আসেন, এবার তাদের ওপর মুশরিকরা আরও বেশি অত্যাচার শুরু করে। এত বেশি নিপীড়নে জর্জরিত করে ফেলে যে, তারা আবারও হিজরত করতে বাধ্য হন। কিন্তু এবার হিজরতের জন্য মক্কা থেকে বের হওয়া এত সহজ ছিল না। কাফেররা তাদের ওপর কঠিনভাবে বাধা আরোপ

১২. সিরাতুন নবি, ১/২২০-২২২ (ঈষৎ সংক্ষেপিত)।

১৩. সিরাতে ইবনে হিশাম, ১/৩৬০

১৪. সিরাতুন নবি, ১/২২৩

করে রেখেছিল। তবুও যেকোনোভাবেই হোক অনেক সাহাবি মক্কা ত্যাগ করে আবারও হাবশায় পৌঁছতে সক্ষম হন। সংখ্যায় তারা ছিলেন প্রায় ১০০জন।[১৫]

ইমাম ইবনে সাদ রহ. বর্ণনা করেন, যখন সাহাবায়ে কেরাম প্রথমবার হিজরতের পর মক্কায় ফিরে আসেন, তখন তাদের ওপর গোত্রের লোকেরা চরম পর্যায়ের নির্যাতন শুরু করে এবং জুলুম-অত্যাচারে তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে ফেলে। ফলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দ্বিতীয়বার হাবশায় হিজরতের নির্দেশ দেন। মূলত এই দ্বিতীয় হিজরত ছিল প্রথম হিজরতের তুলনায় আরও বেশি কষ্টের কারণে। তারা কুরাইশের পক্ষ থেকে মারাত্মক কঠোর আচরণ ও নির্মম নির্যাতন ভোগ করেন। বাদশা নাজাশি মুসলিমদের সাথে কোমল আচরণ করেছেন, সে কারণে মুশরিকদের বিদ্বেষ-জিঘাংসার পারদ চরমে পৌঁছে গিয়েছিল।[১৬]

ইমাম ইবনে সাদ রহ. লেখেন, এই হিজরতে ৮৩জন পুরুষ ও ১১জন কুরাইশি মুসলমান নারী আর ৭জন অকুরাইশি মুসলমান নারী অংশ নেন।[১৭] সর্বমোট ১০১জন মুসলমান হিজরত করেন।

মদিনার পথে হিজরত

ইমাম ইবনে সাদ রহ. লেখেন, যখন মুশরিকদের পক্ষ থেকে মুসলিমদের ওপর কঠিনতর নির্যাতন নেমে আসে, তারা সাহাবায়ে কেরামের জীবন ওষ্ঠাগত করে দেয়, তাদেরকে চরমভাবে অপমান-অপদস্থ করতে থাকে এবং এমনভাবে মৌখিক ও দৈহিক কষ্ট দিতে শুরু করে, যেমনটা ইতিপূর্বে আর ঘটেনি, তখন সাহাবায়ে কেরাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ জানান। প্রত্যুত্তরে তিনি তাদের ইয়াছরিব তথা মদিনায় হিজরতের নির্দেশনা প্রদান করেন। সে অনুযায়ী তারা হিজরত শুরু করে দেন।[১৮]

---

১৫. তবাকাতে ইবনে সাদ, ১/২০৭

১৬. তবাকাতে ইবনে সাদ, ১/২০৭

১৭. তবাকাতে ইবনে সাদ, ১/২০৭

১৮. তবাকাতে ইবনে সাদ, ১/২২৬